৮.৬ জাপানে 'ফ্যাসিবাদ' ও তার স্বরূপ

১৯৩০-এর দশকের জাপান একটি ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র ছিল কিনা, তা নিয়ে সমাজ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। তবে অধিকাংশ ইউরোপীয় লেখক ১৯২০-এর দশকের শেষদিক থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের জাপানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি আলোচনা প্রসঙ্গে ফ্যাসিবাদ (Fascism) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই একই শব্দ জাপানী মার্কস্‌বাদী পণ্ডিতরাও ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাপানে ফ্যাসিবাদের বিষয়টি এখনও সমাজবিজ্ঞানের একটি বিতর্কিত বিষয়।

মূলত, দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে এই বিতর্কের সূত্রপাত। এক, জাপানে আদৌ ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল কিনা? দুই, যদি কখনো জাপানে ফ্যাসিবাদ রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠে থাকে, তবে তার সূচনা কবে থেকে? মার্কস্‌বাদী এবং মার্কস্‌বাদ বিরোধী লেখকেরা ফ্যাসিবাদের সংজ্ঞা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অন্তত একটি জায়গায় সহমত পোষণ করেছেন। উভয়পক্ষই স্বীকার করেন যে, ফ্যাসিবাদী আন্দোলন হল পেটি বুর্জোয়া এবং গ্রামীণ অসন্তোষের একটি রূপ। এই আন্দোলনকে হাতিয়ার করেই একটি কর্তৃত্ববাদী ও অগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত

মার্কস্‌বাদী লেখক রজনী পাম দত্ত (Rajani Palm Dutt) তাঁর *Fascism and Social Revolution* গ্রন্থে বলেছেন—এই কর্তৃত্ববাদী সরকারের প্রধান কাজ "লগ্নী-পুঁজির স্বার্থে মেহনতী মানুষের স্বায়ত্তশাসিত সংগঠনগুলিকে ধারাবাহিকভাবে দমন করা" (Systematic suppression of every form of autonomous organisation of working masses in the interest of finance capital.)। এই সংজ্ঞাকে মেনে নিয়েই ১৯৩০-এর দশকের জাপানের ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদ কথাটির ব্যবহার কতটা যুক্তিযুক্ত, তা আলোচনা করা যেতে পারে।

জাপানী ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে ইংরাজীতে লেখা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ মার্কস্‌বাদী গবেষণা গ্রন্থ—ও. তানিন এবং ই. ইয়োহান (O. Tanin and E. Yohan) রচিত *Militarism and Fascism in Japan* গ্রন্থটি ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে রচিত। তানিন এবং ইয়োহান ১৯৩০-এর দশকের জাপানের রাষ্ট্র কাঠামোকে ফ্যাসিবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করতে কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হাজির করেছেন। তাঁরা বলেছেন—প্রাথমিকভাবে ফ্যাসিবাদ লগ্নীপুঁজির হাতিয়ার (instrument of finance capital)। সেক্ষেত্রে জাপানের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল জাপানের রাজতন্ত্রকে কেন্দ্র করে। জাপানী রাজতন্ত্রে দুটি শ্রেণীর সমন্বয়ের প্রতিফলন ঘটেছিল—লগ্নীপুঁজির বিনিয়োগকারী এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক জমিদার। এই দুই শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজতান্ত্রিক আমলাতন্ত্র এবং সেনাবিভাগেরও একটি স্বাধীন সত্তা ছিল। ফলে দেখা যায় যে, জাপানে ১৯২০-এর দশকের শেষের দিকে যারা প্রতিক্রিয়াশীল ও উৎকট স্বাদেশিকতা-সম্পন্ন আন্দোলনে মদত দিয়েছিলেন, তাঁরাই সামরিক সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্য-বাদী (Military-Feudal Imperialism) রাষ্ট্রব্যবস্থায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই প্রতিক্রিয়াশীল উগ্র জাতীয়তাবাদীরা কিন্তু কখনোই তৎকালীন ইউরোপের ফ্যাসিস্ট নেতাদের মতো সস্তা জনপ্রিয় সামাজিক বক্তৃতার (Social demagogy) ধার ধারেনি। সুতরাং পশ্চিম ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদী দেশগুলির সাথে জাপানের রাষ্ট্র কাঠামোর উপরোক্ত তফাৎগুলি লক্ষণীয়। তাই তানিন ও ইয়োহান জাপানী রাষ্ট্র-কাঠামোকে ফ্যাসিস্ট হিসাবে আখ্যায়িত করতে নারাজ। তাঁদের মতে, তৎকালীন জাপানে একটি প্রতিক্রিয়াশীল ও উৎকট স্বাদেশিকতাসম্পন্ন (Reactionary and Chauvinist) রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, যার মেরুদণ্ড ছিল সামরিক বাহিনী।

অপর এক মার্কস্‌বাদী সমাজবিজ্ঞানী ও তৎকালীন কমিন্টার্নের গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক কার্ল রাদেক (Karl Radek) কিন্তু তানিন ও ইয়োহানের সাথে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেছেন। রাদেক তানিন ও ইয়োহান রচিত গ্রন্থটির ভূমিকায়

জোরের সাথে বলেছেন, জাপান অবশ্যই একটি ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র ছিল। নিজ বক্তব্যের সমর্থনে রাদেক বলেছেন—যে-কোন ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রেই লগ্নীপুঁজির প্রশ্নাতীত প্রাধান্য থাকে, জাপানেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। তাঁর মতে, তানিন ও ইয়োহান জাপানের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর অস্তিত্বের ওপর অহেতুক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রাদেক বলেছেন—জাপানে পুঁজিবাদী উন্নয়নের ক্ষেত্রে একচেটিয়া পুঁজিবাদ (Monopoly Capitalism) প্রাধান্য বিস্তার করতে আরম্ভ করেছিল, ফলে জাপান একটি চূড়ান্ত ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের স্তরে উন্নীত হয়েছিল। তবে কোন্ সময় থেকে জাপানে ফ্যাসিস্টতন্ত্রের সূচনা হয়েছিল, এ বিষয়ে কার্ল রাদেক নীরব।

প্রখ্যাত জাপানী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মরুইয়ামা মাসাও (Maruyama Masao) ফ্যাসিবাদের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা এবং জাপানী অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনা করে বলেছেন—জাপানের রাষ্ট্র-কাঠামোকে যদি ফ্যাসিস্ট আখ্যায় ভূষিত করতে হয়, তবে ফ্যাসিবাদের সূচনাবিন্দু অনুসন্ধান করতে গিয়ে যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইনুকাই-এর হত্যাকাণ্ডের পরই জাপানে দলীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত মন্ত্রীসভার অবসান ঘটেছিল। তারপর শুরু হয়েছিল সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্বাধীন মন্ত্রীসভার যুগ। কিন্তু রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণাধীন মন্ত্রীসভা কোনো অর্থেই জাপানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করেনি। সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্বাধীন শাসনব্যবস্থা জাপানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করেছিল বটে, তবে দুই আমলেই প্রায় একই রকম অগণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় ছিল। মরুইয়ামা ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে তোজোর* শাসনব্যবস্থার সাথে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ইনুকাই-এর শাসনব্যবস্থার মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য খুঁজে পাননি। তিনি জাপানের ফ্যাসিবাদের সূচনার কাল সম্পর্কে সন্দিহান। তাই ঐ বিশেষ সময়ের জাপানের রাষ্ট্র-কাঠামোকে তিনি ফ্যাসিস্ট হিসাবে চিহ্নিত করেননি। জাপানে বরাবরই নাগরিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছিল এবং শাসন-কাঠামোতে দীর্ঘদিন ধরেই কর্তৃত্ববাদ ও অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বীজ নিহিত ছিল।

ব্যারিংটন মুর (Barrington Moore) জাপানী ফ্যাসিবাদের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে বলেছেন ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীকালে জাপানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির উচ্চতম স্তরে যে হত্যাকাণ্ডগুলি হয়েছিল, "সেই হত্যাকাণ্ডগুলি পুরোদস্তুর ফ্যাসিবাদের পরিবর্তে আধা-সামরিক নায়কতন্ত্রের যুগের সূচনা করেছিল"

(These assassinations only inaugurated a period of semi-military dictatorship rather than of outright fascism.)। ব্যারিংটন মুর অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র-কাঠামোর বেশকিছু বৈশিষ্ট্য তদানীন্তন জাপানের রাষ্ট্রব্যবস্থায় বর্তমান ছিল। জাপানের রপ্তানি হ্রাস পাবার ফলে সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কৃষক শ্রেণী। জাপানের সামরিক নেতারা ক্ষমতায় উঠে আসার ক্ষেত্রে কৃষি অসন্তোষকে ব্যবহার করেছিলেন। তাছাড়া গোটা ১৯৩০-এর দশক জুড়ে অভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বৃহৎ ব্যবসায়ী ও লগ্নীপুঁজির বিনিয়োগকারীদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। বৃহৎ পুঁজিপতিরা বা লগ্নীপুঁজির বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলি (জৈবাৎসু) একদিকে সেইযুকাই বা মিন্‌সেইটো প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলির সাথে সম্পর্ক রেখেছিল, অন্যদিকে প্রশাসনে কর্তৃত্ব স্থাপনকারী সামরিক বাহিনীর সাথেও তাদের যোগাযোগ ছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত সামরিক বাহিনীর কার্যকলাপ তাদের স্বার্থহানি ঘটায়নি, ততক্ষণ তারা সামরিক বাহিনীর নায়কতন্ত্রকে সহ্য করেছিল। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারির অভ্যুত্থানকারীদের চরম শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। কারণ, বৃহৎ পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী রাজনৈতিক গোষ্ঠী ঐ মুহূর্তে সামরিক বাহিনীর বিশৃঙ্খলা ভাল চোখে দেখেনি। উগ্র দক্ষিণপন্থী ভাবধারার গুরুত্বপূর্ণ প্রবক্তা এবং এশিয়াতে জাপানী সম্প্রসারণের বড় সমর্থক কিতা ইক্কি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী নিশিদা জেই-কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ফ্যাসিস্ট ইতালিতে বা নাৎসী জার্মানিতে কোন দক্ষিণপন্থী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়নি। আবার ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে মাঞ্চুরিয়ার জাপানী সৈন্যাধ্যক্ষরা ঘোষণা করেছিল যে, জৈবাৎসু সংস্থাগুলিকে মাঞ্চু-কুয়ো থেকে অর্জিত সম্পদ ভোগ করতে দেওয়া হবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জৈবাৎসু এবং সামরিক গোষ্ঠীর মধ্যে একটা বিরোধের জায়গাও ছিল। নিশান প্রভৃতি সংস্থা যারা নয়া জৈবাৎসু বা শিন্টো জৈবাৎসু হিসাবে পরিচিত ছিল, তারাই মাঞ্চু-কুয়োর খনিতে বা রেলপথে লগ্নীপুঁজির বিনিয়োগ করতে এগিয়ে এসেছিল। এদের মাঞ্চুরিয়ার সামরিক নেতারা সমর্থন করলেও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে পুরাতন জৈবাৎসু গোষ্ঠীর যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। জার্মানি বা ইতালিতে এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়নি। তাই জাপানে ফ্যাসিবাদের ক্ষেত্রে আধা-সামাজিক নায়কতন্ত্র কথাটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছেন ব্যারিংটন মুর।

ঐতিহাসিক জন হ্যালিডে (Jon Halliday) জাপানী ফ্যাসিবাদের বিষয়টি নিয়ে একটি যুক্তি-নির্ভর আলোচনা করে বলেছেন যে, জাপানের রাষ্ট্র-কাঠামোর ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদ শব্দটি আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন যে,

১৯২০-র দশকের শেষদিক থেকেই জাপানে একটি শক্তিশালী ফ্যাসিস্ট আন্দোলন চলেছিল। কিন্তু একই সাথে হ্যালিডে বলেছেন—তাতে কিছু যায় আসে না কারণ, ১৯৩০-এর দশকে গ্রেট ব্রিটেনেও একটা ফ্যাসিস্ট আন্দোলন চলেছিল, কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনকে কখনোই একটি ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র বলা যাবে না। তিনি জাপানকে ফ্যাসিস্ট না বলার পেছনে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তির অবতারণা করেছেন। প্রথমত, তিনি জাপানের নির্বাচনগুলিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হিসাবে দেখেছেন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনগুলি সীমিত নির্বাচকমণ্ডলীর অংশগ্রহণ সত্ত্বেও মোটামুটি অবাধ হয়েছিল। এমনকি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনেও খোদ তোজোর বিরোধী সদস্যরাও বেশকিছু আসন দখল করেছিলেন। ফ্যাসিস্ট ইতালি বা নাৎসি জার্মানিতে এ ধরনের ব্যাপার কল্পনাতীত ছিল। দ্বিতীয়ত, ইতালির ফ্যাসিস্ট দল বা জার্মানির নাৎসি দলের মতো একমাত্র সরকার স্বীকৃত কোন গণদল (Mass Party) জাপানে ছিল না। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে কোনোয়ের নেতৃত্বে Imperial Rule Asistance Association নামে একটি জাতীয় দল গঠিত হয়েছিল বটে, কিন্তু তার সাথে নাৎসি দল বা ফ্যাসিস্ট দলের কোন সাদৃশ্য ছিল না। সেই সময় চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর পরিপ্রেক্ষিতে যে মারাত্মক রণোন্মাদনা এবং উৎকট স্বাদেশিকতা জাপানকে গ্রাস করেছিল তারই ফলশ্রুতি হিসাবে রাজনৈতিক দলগুলি স্বেচ্ছায় নিজেদের ভেঙে দেয় এবং সম্রাটকে সাহায্য করার হাতিয়ার হিসাবে উক্ত সংগঠন গড়ে ওঠে। তৃতীয়ত, জার্মানির হিটলার বা ইতালির মুসোলিনির মতো জাপানে তেমন কোন একক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, যিনি গোটা ফ্যাসিস্ট কাঠামোকেই নিয়ন্ত্রিত করতে পারতেন। বরং জাপানের সম্রাটকে তখনও প্রশ্নাতীত মর্যাদার আসনে বসানো হয়েছিল। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে তোজো যখন ব্যাপক রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী, তখনও পর্যন্ত তিনি চূড়ান্ত রাজানুগত্য দেখিয়েছিলেন। ইতালির দ্যুজে (Duce) বা জার্মানির ফুয়েহরার (Fuhrer)-এর সমতুল্য কোন রাষ্ট্রনায়কের পদ জাপানে ছিল না। চতুর্থত, বিংশ শতকের গোড়াতেই শ্রমিক আন্দোলনকে দমন করার কঠোর রাজনৈতিক প্রক্রিয়া জাপানে আরম্ভ হয়। হ্যালিডের মতে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের জাপান যদি 'ফ্যাসিস্ট' ছিল, তবে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের জাপানকেও সম্ভবত ফ্যাসিস্ট বলা উচিত (If Japan was Fascist in 1941, it perhaps should be called Fascist in 1915.)। ১৯৩০-এর দশকের শেষদিকে জাপানে শ্রমিকশ্রেণীর স্ব-শাসিত সংগঠনগুলির ওপর দমন-পীড়ন আরও তীব্রতর করা হয়েছিল, কিন্তু জার্মানি ও ইতালির তুলনায় এই দমন-পীড়ন ছিল অনেক কম।